Baromas, Autumn 2010, pp 70-77

গীতিকারের আধুনিকতা: অজয়কুমার ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৪৩)

দীপেশ চক্রবর্তী

বাংলা 'আধুনিক' গানের ধারাটি আজ লুপ্তপ্রায়। বলা যেতে পারে ১৯৩০-এর দশক থেকে ১৯৭০-৮০-র দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এই ধারা। গান-করা গান-শোনা বাঙালি সামাজিকতার অন্যতম অঙ্গ—হয়তো মজলিশের ধারণাটিই আমাদের নানান সামাজিকতায় খণ্ডিতভাবে বেঁচে থাকে। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গানও বিবর্তিত হয়েছে— বৈঠকী টপ্পা এক সময় রবীন্দ্রনাথের হাতে ব্যক্তি-মানুষের আত্মপ্রকাশের বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গানের এই বিবর্তনের ইতিহাসে গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। গ্রামোফোন রেকর্ড বিশ শতকের গোড়াতেই চালু হয়ে গিয়েছিল; ১৯২৭ সাল নাগাদ এলো রেডিও, আর ১৯৩৫ সাল নাগাদ সড়গড় সবাক চলচ্চিত্র বা টকিজ। এই ত্র্যহস্পর্শ যোগের ফসল বাংলা আধুনিক গান। গুণী বাঙালির কাছে জীবিকা অর্জনের নতুন রাস্তা খুলে গেল। কেউ হলেন সুরকার, কেউ বা গায়ক, কেউ গীতিকার। নাম করা সাহিত্যিকরা সিনেমার পথে পা বাড়ালেন— প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়। উনিশশো বিশের দশকে কবি নজরুল কবিতা লেখা প্রায় বন্ধ করে ত্রিশের দশক থেকে সংগীত রচনাতেই মন দিলেন— বলতেন যে গ্রামোফোন, রেডিও ও চলচ্চিত্রের পয়সায় তিনি গাড়ি চড়তে পারেন, নিছক কবিতা লিখে তো আর তা হবে না। ছায়াছবির গানেও সুর দিয়েছিলেন নজরুল।

এই সময়েই তৈরি হয় গানের একটি নতুন পণ্যায়িত রূপ: 'আধুনিক গান'। আড়াই কি তিন মিনিটের গান, রেকর্ড ধৃত, কিন্তু রেডিও বা সিনেমা মারফত প্রচারিত। এই পণ্যায়নের ইতিহাসে কিন্তু গানের এক ধরনের গণতন্ত্রীকরণের ইতিহাসও লুকিয়ে আছে। গান বাজারি হবার শর্তই ছিল যে, গানের কোনো-রকম শিক্ষা নেই, এমন মানুষও গান গাইতে পারবে। এই পরিবর্তনও একদিনে হয়নি। 'আধুনিক' গানেরও ইতিহাস আছে। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় 'আধুনিক' গান শেষ হয়ে গেলেও, এই তালিকা ছাড়াই গান গাইবার যে গণতন্ত্র, তা কিন্তু আজও গানের পণ্যায়নের ইতিহাসে অব্যাহত আছে।

(আগে বাঙালি বুদ্ধিজীবী দেখেছি যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে খুব গণতন্ত্র পছন্দ করেন, মায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র এলেও তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু গানের ক্ষেত্রে তাঁদের নাক চার তলায় উঠে থাকে। সে অন্য গল্প। আমাদের ইতিহাসের ঐ কানাগলিতে আজ ঢুকব না।)

আধুনিক গানের প্রথম যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য (রেকর্ডে 'অজয়কুমার' নামটি সংক্ষিপ্ত করা হতো)। 'প্রথম যুগ' বলার কারণ আছে। ১৯৩৬/৩৭ সাল থেকে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্তই প্রথম যুগ। উনিশশো তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ সাল নাগাদ শচীনদেব জীবিকার খোঁজে বম্বে চলে যান। পঙ্কজ মল্লিক, হিমাংশু দত্ত, জ্ঞান দত্ত, অনুপম ঘটকের জায়গায় পঞ্চাশের দশকে উঠে আসেন অন্যান্য সুরকারেরা। গীতিকার হিসেবেই অজয় ভট্টাচার্য (তাঁর অবশ্য ১৯৪৩-এ মৃত্যু হয়), সুবোধ পুরকায়স্থ, শৈলেন রায় বা মোহিনী চৌধুরীর স্থান নেন পবিত্র মিত্র, শ্যামল গুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, ও তারও পরে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর বসু, মিন্টু ঘোষ, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা। পঞ্চাশের দশকে নতুন নতুন গায়কেরও আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই কুশীলব পরিবর্তন ছাড়াও গানের একটি আঙ্গিকগত কারণেও ত্রিশের বা চল্লিশের আধুনিক গানকে প্রথম যুগের গান বলা যায়। আমার ধারণা যে এখানেও বাংলা গানের সঙ্গে হিন্দি ছায়াচিত্রের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

তার ইঙ্গিত মেলে শচীনদেব বর্মনের একটি কথায়। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি একদা বলেছিলেন যে বম্বে যাবার পর ছায়াছবির গান সম্বন্ধে তাঁর একটি অভিজ্ঞতা হয়। কোনো একটি হোটেলে অবস্থান কালে তিনি হঠাৎ শোনেন যে ঐ হোটেলেরই একটি 'বয়' একটি হিন্দি ছবির গান গুনগুন করে ভাঁজছেন। খুব সম্ভবত এই সুরটি ছিল নৌশাদ-কৃত। শচীনদেবের তখন হঠাৎই একটি উপলব্ধি হয়—তিনি বুঝতে পারেন যে গণ-মাধ্যমের যুগে গানকে যদি সত্যি জনপ্রিয় হতে হয়, তাহলে সুর এমনটিই হতে হবে যাতে যে-কোনো মানুষের মনে হয়, বাঃ এই গানটি তো আমিও গাইতে পারি!

এর ফলে তাঁর সৃষ্ট সুরের ধারাটিই ইচ্ছাকৃতভাবে বদলে ফেলেন শচীনদেব। রাগ-রাগিণীতে তাঁর অনেক সুরের ভিত্তি থাকলেও সুরকে তিনি দ্রিপি ও চটুল করার দিকে মন দেন। এর প্রভাব তাঁর বাংলা গানেও পড়েছিল। ত্রিশের চল্লিশের দশকের আগে বেশি রাগ-ভিত্তিক গান তৈরি হতো— শচীনদেবের বা ভীষ্মদেবের অনেক গানেই যার প্রমাণ মিলবে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলা গানে 'রাগপ্রধান' বলে একটি অন্য জাতেরই সৃষ্টি হলো। গানের ভাব-ভাষা-সুরও অনেক ক্ষেত্রেই মধুর কিন্তু সহজ হয়ে এল (হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হয়তো তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ)। তাছাড়া গানের যন্ত্রাণুষঙ্গও বদলাচ্ছিল। একটু মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে পঞ্চাশের-ষাটের গানে একটি যন্ত্রের বহুল ব্যবহার শুরু হয় তা হলো পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন। মূলত ওয়াই এস মূলকী বাজাতেন (পরবর্তীকালে তিনি দু একটি গানে সুরও করেছিলেন।) আধুনিক গানের কম্পোজিশন বা গানে যন্ত্র বা যন্ত্রীর ব্যবহারের ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। কিন্তু উপরে উল্লিখিত কারণে আমার মনে হয় যে ১৯৩৬/৭-১৯৪৩/৪৪-এর সময়টিকে বাংলা আধুনিক গানের প্রথম পর্ব বা যুগ বললে ভুল বলা হবে না।

এই প্রথম যুগের গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। আজ তিনি বিস্মৃতপ্রায় হলেও সংগীতপ্রিয় অনেকের স্মৃতিতেই তিনি বেঁচে থাকবেন। শচীনদেবের 'ঝন ঝন ঝন মঞ্জীর', 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে', 'ওরে সুজন নাইয়া', 'বল বল বল বঁধু, কে এলো আজ দ্বারে', বা ভীষ্মদেবের 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা আমারে ভুলিও প্রিয় অথবা হিমাংশু দত্তের সুরে (যতদূর মনে পড়ে) তারাপদ চক্রবর্তী-গীত 'ফাগুনের সমীরণ মনে' ইত্যাদি গানে তিনি অমর হয়ে আছেন।

পবিত্র সরকার এক সময় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন দুটি মানুষের প্রভাব 'আধুনিক' গানের গোড়াপত্তন করেছিল: নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ। এ কথা যে কত সত্য, অজয় ভট্টাচার্য তার প্রমাণ। ১৯৪৩ সালে তাঁর হঠাৎই দেহাবসান ঘটলে, তখনকার দিনের চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (ইনি 'পরিণীতা', 'শেষ রক্ষা' ইত্যাদি ছবির পরিচালক) তাঁর স্মৃতিচারণে একটি মজার গল্প বলেন। ১৯২৭ কি ২৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম এ-র ছাত্র। অজয় ভট্টাচার্য তাঁর সহপাঠী (অজয় ভট্টাচার্য ১৯২৯ সালের এম এ)। একদিন পশুপতি বাবু কথায় কথায় অজয় ভট্টাচার্যকে বলেন, 'নজরুল একখানা চমৎকার গান লিখেছে— কাল রেকর্ডে শুনলুম।' কী গান? অজয়ের জিজ্ঞাসা। উত্তরে পশুপতি প্রথম লাইন গেয়ে শোনালেন: হাসনুহানা আজ নিরালায় ফুটলি কেন আপন মনে? ফুলদরদী তোর সে বঁধু আসবে না আর ফুল-কাননে। শুনে অজয় ভট্টাচার্যের মুচকি হাসি—'গান খানা নজরুলের লেখা নয়'। 'বলো কি? তাহলে এমন লেখা কে লিখল?' 'আমি হে, আমি।'[১]

এটিই অজয় ভট্টাচার্যের প্রথমদিকের রেকর্ড হওয়া গানের মধ্যে একটি। নজরুলের প্রভাব পরিষ্কার। আবার গানের খাতায় দেখছি হস্তাক্ষরে পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের নকল করতেন (অন্তত তাড়াহুড়োয় না লিখলে)। এমনকি বাংলা ১৩৪১ সালের গানের খাতার ভেতরে রাখা তাঁর নাম-সঙ্কলিত ব্যক্তিগত চিঠি লেখার প্যাডের যে কয়েকটি পাতা আছে, তার থেকে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে নানান আঁকিবুকি কেটে নিজের নামের আদ্যাক্ষর 'র' চিঠির প্যাডে বসিয়েছিলেন, অজয় ভট্টাচার্যও তাঁর প্যাডে ঐ রকম আঁকিবুকি করা 'অজয়' ছাপাতেন। তাছাড়া অনেক খাতার মলাটেই নিজের নামের সই বা সংক্ষিপ্ত সই (initial) করা আছে। গানের ভাষা ছাড়াও এই সব ছোটোখাটো আত্মগত ব্যবহারে—হাতের লেখা, নামসই—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত style-এর প্রভাব স্পষ্ট।[২]

অজয় ভট্টাচার্যের মতো আধুনিক গানের গীতিকারদের জীবন দেখলে মনে হয় যে পঞ্চাশের দশক থেকে যেমন কবি ও গীতিকার আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, গোড়ায় তেমন হয়নি। গৌরীপ্রসন্ন কবিতা আলাদা করে লিখেছিলেন বলে শুনেছি কখনো। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুচারটে ছড়া ছেলেদের পত্রিকায় দেখেছি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কবি-খ্যাতির পেছনে এঁরা ছোটেননি। অজয় ভট্টাচার্য তা ছিলেন না। হয়তো বা এতে চোখের ওপর দেখা কবি-গীতিকার—নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তদের একটি প্রভাবও ছিল (এঁরা অবশ্য সুরকারও ছিলেন)। ছোটোবেলা থেকেই নাকি গান, কবিতা লিখতেন অজয়কুমার। ত্রিপুরার শ্যামগ্রাম নামক একটি গ্রামে ১৯০৬ সালে অজয় ভট্টাচার্যের জন্ম। বাবা কুমিল্লায় উকিল, তাই বড়ো হওয়া নিকটস্থ কুমিল্লা শহরে। শহর বলতেও তেমন ভারি কিছু নয়। ত্রিপুরারই অধিবাসী রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ লিখেছেন, তখনকার কুমিল্লার টাউন বলতে 'চারিদিকে ঝোপ-ঝার, বড় বড় বুনো গাছের আড়ালে ছোট ছোট বাড়ি, কেরোসিনের টিনে ছাওয়া, আলোহীন কাঁচা মেঠো রাস্তায়, নালায়-নালায় মশার আড়ৎ আর তারই মধ্যে ঠুং ঠাং করে ছুটে চলছে খানকতক ঘোড়ার গাড়ি।' যেখানে দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর পাঠশালায় অজয়কুমারের শিক্ষা শুরু।[৩] পড়াশুনোয় ভালো ছাত্র ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে ব্যথিত হয়ে এককালীন ঈশ্বর পাঠশালার 'আদর্শবাদী' শিক্ষক আমার ধারণা ইনিই পরবর্তীকালে ফরিদপুরের এক (কোন?) কলেজের নামজাদা অধ্যক্ষ

হয়েছিলেন—অবনীমোহন চক্রবর্তী অজয়কুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখেন: ২৬ বৎসর পূর্বের সমস্ত কথা আজ আমার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে। ... ব্যবসায়ীর জীবন লইয়া কার্যক্ষেত্রে নামি নাই। নামিয়াছিলাম একটি স্বপ্ন লইয়া এবং সে স্বপ্ন সফল করিয়াছ তোমরা। জীবনে সার্থককতার আনন্দ যাহাকে দিয়া পাইয়াছি সেই তো পরম আপনার জন।[৪]

ইস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সংগীত, সাহিত্য, গান, নাটক ইত্যাদিতে পারদর্শিতার জন্য ও তদুপরি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার ফলে কুমিল্লা শহরে বেশ নামডাক হয় অজয় ভট্টাচার্যের। তাঁর মৃত্যুর পর *রূপমঞ্চ* পত্রিকাটির যে 'অজয় স্মৃতি সংখ্যা' প্রকাশিত হয় তাতে গ্রন্থিত নানান প্রবন্ধের একটি প্রধান সুর এইটিই যে নিছক গীতিকার নন, অজয় ভট্টাচার্য একজন কবি ও তাঁর ছিল সাহিত্যগত প্রাণ। নারায়ণ চৌধুরী (ইনি কুমিল্লার মানুষ, ১৯৪৩ সালে এম্পায়ার টকি ডিসট্রিবিউটর্সের প্রচার-সচিব) অমল দত্ত (ইনিও কুমিল্লার অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত *অশোক* ও *ছদ্মবেশী* চিত্রে সহকারী পরিচালক ছিলেন), কবি গোপাল ভৌমিক (ইনি তখন *রূপমঞ্চ* পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য)— এঁরা সকলেই তাঁদের স্মৃতিচারণায় এ প্রসঙ্গে জোর দিয়েছেন। ঘুরে ঘুরেই এসেছে নজরুলের *ধূমকেতু* পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'উল্কা'র কথা, কুমিল্লায় থাকতেই কনিষ্ঠ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক হয়ে তাঁর 'পূর্ব্বাশা' প্রকাশ করার কথা, তাঁর *ওমর খৈয়াম* ও *রোড ব্যাক*অনুবাদের কথা ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ *রাতের রূপকথা, ঈগল* বা তাঁর উপন্যাস *যেথা নাহি প্রেম* উল্লেখযোগ্য।[৫]

অজয় ভট্টাচার্য সাহিত্যপ্রিয় মানুষ ছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবৎকালেই তাঁর গান যত জনপ্রিয় হয়েছিল, তাঁর কবিতা অত জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। আর এখন তো কবি হিসেবে তাঁকে আমরা ভুলেই গিয়েছি। এর কারণও আছে: তাঁর কবিতাগুলি ক্রমশই বক্তব্য ভারাক্রান্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ও বেশ কিছু তৎসম শব্দের সংকলন তাঁর লাইনগুলোকে থামোথা গুরুভার করে তুলত। উনিশশো ত্রিশের শেষে, চল্লিশের গোড়ায় নানান বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মতো অজয় ভট্টাচার্যও খানিকটা সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছিলেন। লেনিন সম্বন্ধে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। তাঁর তদানীন্তন সহকারী পরিচালক অমল দত্ত অজয় পরিচালিত *ছদ্মবেশী* ছবিটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন: 'আমরা স্থির করলুম খানিকটা socialism এই ছবিতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। যাতে লোকেরা হাসির মাঝেও দুই একটি বুলি মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। তাই 'মিষ্টার বোসের' অবতারণা।'[৬] (মিস্টার বোসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস; ছবিটি অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পরে মুক্তি পায়)। তাঁর কবিতাও এই রকম বক্তব্যপ্রধান হয়ে উঠছিল— যেমন ধরুন *ঈগল ও অন্যান্য কবিতা*-র *মানুষ* কবিতাটির প্রথম কটি লাইন।

শতাব্দীর লৌহচরে আজো মোরা নিষ্পেষিত মানুষেরা
হইনি বিলীন,
আছে পরমায়ু আজো, দীর্ণ পঞ্জরের মাঝে আহত
নিঃশ্বাস বহে ক্ষীণ
এখনো শুনতে পাবে। কোমল এ রক্ত মাংস কঠিন
পাষাণ চেয়ে বুঝি,
বক্ষ পরে পাষাণের ভারে নিশ্চিহ্ন হল না তাই, আজো
কিছু পাবে খুঁজি।[৭]

শচীন দেববর্মন কিন্তু তাঁর বন্ধুটিকে ঠিকই চিনেছিলেন: 'মোট কথা, অজয়ের সত্যকার পরিচয় সে গীতিকার।'[৮] অজয় ভট্টাচার্যের কবিতা রসোত্তীর্ণ হলেও কালোত্তীর্ণ হয়নি। কিন্তু তাঁর রচিত বহু গান, এমনকি যার অনেকগুলিই ফরমায়েশি, এখনো সংগীতপিপাসুদের মনে বেঁচে আছে। লিরিক-ধর্মী গীত বা কবিতা রচনায় তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণ হতো। উদাহরণ হিসেবে একটি গানের কথা বলি। হিমাংশু দত্তর সুর, তাঁর সেই প্রখ্যাত 'চামেলি' সিরিজের গান, ধরে নিচ্ছি ফরমায়েশি রচনাই। গানটি আমি কোনোদিন শুনিনি, কিন্তু গানটির ভাবে, ভাষায়, ছন্দলালিত্যে কেমন একটি অস্ফুট ছবি ফুটে ওঠে, সুরে ঢেলে শুনতে ইচ্ছে করে গানটি:

একা চলিতে
যেন স্বপ্নে
দেখিনু তারে
চামেলী বনে
সলাজ আঁখি
আনত রাখি
খেলিতে ছিল
ছায়ার সনে
দেখেছি ফুল
চরণে ঝরে
জোছনা তারে
আরতি করে
ডাকিনু যবে
মিলালো নভে
কথার ছোঁয়া
মানে না মনে।।[৯]

১৯২৯-এ এম এ পাশ করার পর আবার কুমিল্লায় ফিরে যান অজয়কুমার ও সেখানে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। *পূর্ব্বাশা*-র দ্বিতীয় বর্ষে তাঁর উপন্যাস *যেথা নাই প্রেম* প্রকাশিত হয়। সদ্য বিবাহিত অজয়কুমারের অধ্যাপনার পয়সায় কুলোত

না। তাঁর জীবনের রূপরেখায় রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ লিখেছেন: 'ছাত্র জীবনের রঙীন স্বপ্ন তখন চলে গেছে। বেকার জীবনের রূঢ় বাস্তবতা তাঁর বিবাহিত জীবনকেও গ্রাস করতে চেয়েছিলো। তখন তিনি ত্রিপুরা রাজবাড়ির কুমারদের জন্য কুমিল্লায় কুমার বোর্ডিং-এ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই গৃহশিক্ষকতা অজয়ের পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিল।'[১০] ধরে নিচ্ছি এই সূত্রেই তাঁর শচীন দেববর্মনের সঙ্গে পরিচয় ও আজীবন বন্ধুত্ব। শুধু শচীনদেবই নন, কুমিল্লা শহরের তাঁদের 'লক্ষ্মী কেবিনের' চায়ের আড্ডায় আসতেন সুরকার হিমাংশু দত্ত ও জ্ঞান দত্ত। আসতেন পরবর্তীকালের 'চিত্র গীতিকার' সুবোধ পুরোকায়স্থ ও পরে নাম করা চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় নাকি ঠাট্টা করে বলতেন, 'আপনাদের কুমিল্লার মাটিতে গান আছে, ও মাটি একবার খেয়ে দেখতে হয়।'[১১]

কলকাতায় এসে অজয় ভট্টাচার্য ১৯৪০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার তীর্থপতি ইনসটিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু ঐ 'লক্ষ্মী-কেবিনের' আড্ডাতেই তাঁর গীতিকার জীবনের শুরু। ১৯৩৪ সালের অগাস্ট মাসে একদিন তিনি অমল দত্তকে বলেন: 'অমল, কলকাতা চললাম। কর্তা (কুমার শচীন দেববর্মন) চিঠি লিখেছেন যেতে।' অমল দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু ভরসা কি?' 'ভরসা কর্তা। তা ছাড়া একটা এম এ ডিগ্রী আছে তো।' অমল দত্ত আরো লিখেছেন, 'কলকাতায় এসে অজয়কুমারের সাংসারিক সমৃদ্ধি হয়—তাঁর প্রকৃত আয় ছিল গান ও সিনেমার গল্প ও সংলাপ রচনায়। কুমার শচীন দেববর্মন ও জ্ঞান দত্ত আদর্শ বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন, তাঁরাই অজয়দার গান সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অজয়দার আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণ হয়েছিলেন। তারপর অজয়দা অতি সহজেই আপন প্রতিভার প্রসাদে নিউ থিয়েটার্স ও অন্যান্য স্থানে প্রবেশপত্র পেয়েছিলেন।'[১২]

এই প্রতিভার কথাটি সর্বাংশে সত্য। সুর শুনেই খুব চটপট কথা বসাতে পারতেন অজয়কুমার। শচীন দেববর্মন লিখছেন '... কালে সে সঙ্গীত রচনায় এমনই দক্ষ হয়ে উঠেছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে নির্দিষ্ট গানের ছকে ফেলে অপূর্ব গান রচনা করে দিতে পারতো কয়েক কাপ চা ও কয়েকটি সিগারেট এবং কালি কলম কাগজ দিয়ে এক জায়গায় বসিয়ে দিতে পারলে। দিয়েছেও সে কয়েক কাপ চা ও কয়েকটি সিগারেট খেতে খেতে আমার বাড়িতে বসে আমার মনোনীত সুরের ছকে ফেলে আমার গান রচনা করে। তার দৃষ্টান্ত... "সহেলী গো", "তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে" ইত্যাদি। প্রথমটি রচনা করতে তার এক ঘণ্টারও কম সময় লেগেছিল। দ্বিতীয়টি সে রচনা করে দেয় মিনিট পনেরো সময়ের মধ্যে। সত্যি কথা বলতে কি, ক্ষিপ্র হস্তে গান রচনা করার ক্ষমতা আছে দেখেছি কাজী নজরুলের, আর ছিল অজয়ের।'[১৩] এই ক্ষিপ্রতার কথা গোপাল ভৌমিকও লিখেছেন। তিনি কলেজে পড়াকালীন সময়ে— অর্থাৎ ১৯৩৫ সাল নাগাদ—অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচিত হন। একদিন রাত দশটারও পরে তাঁরা গিয়ে হাজির হন তখনকার প্রসিদ্ধ ঠুংরি গায়ক শচীনদাস মতিলালের বাড়িতে। মতিলাল তখন 'হারমোনিয়াম নিয়ে কি একটা সুর সাধছিলেন। অজয়বাবু বসে বসে নিবিষ্ট চিত্তে সেই সুর শুনে তখনই একটি বাংলা গান লিখে ফেললেন এবং শচীনদাস মতিলাল তখনই সেই গানটিতে সুর সংযোগ করে আমাদের শুনিয়ে দিলেন। গীতিকার অজয়বাবুর এই অপূর্ব নৈপুণ্য দেখে সেদিন যে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলাম— আজ সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুনেছি কাজী নজরুল ইস্‌লাম এমনভাবে গান বা কবিতা লিখতে পারেন, আর চোখের সামনে উদাহরণ দেখেছিলাম অজয়বাবুর।'[১৪]

কেবল ক্ষিপ্রহস্তে গান লেখার ক্ষমতাই ছিল না অজয় ভট্টাচার্যের। তাঁর গানের ভাষা মানুষকে আকর্ষণ করত। তাঁর ছবি *ছদ্মবেশী* উদ্বোধনের দিনে একটি স্মরণ সভা হয়। সেই সভায় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার বলেছিলেন: "তাঁর গান যেন নতুন সুরে নতুন কথা দিয়ে বাঙ্গালীকে মাতিয়ে তুলেছিল। একবার মনে পড়ে, বাড়ির মেয়েরা রেকর্ড বাজিয়ে শুনছিলেন, গানের কথাগুলি যেন কেমন লাগলো, আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম— কার লেখা? দেখলাম অজয় ভট্টাচার্যের।"[১৫] প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁর শোকবার্তায় অজয়কুমারের গানের 'মধুর সংযত সরসতা'র উল্লেখ করেছিলেন।[১৬] প্রখ্যাত অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন: 'তাঁর রচিত গান রেকর্ড, রেডিও ও ফিল্মে শুনে মুগ্ধ হয়ে কতবার ভেবেছি—যদি লোকটির সঙ্গে আলাপ হত! তাঁর রচিত গান "তুমিও বধু জান, কাঁদিছে কেন আঁখি", শুনে এতদূর মুগ্ধ ও বিচলিত হয়েছিলাম যে তখনই অনুসন্ধান করে জানলাম গানটি কে লিখেছে।'[১৭]

আসলে, রেকর্ডিং কোম্পানি, রেডিওর প্রোগ্রাম ও সবাক ছায়াছবির পটভূমিকায় গুণী মানুষের বাঁচবার, কাজ করবার কতগুলো নতুন পথ খুলে যাচ্ছিল। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও পত্রিকা, বই, প্রকাশক, ছাপাখানা মিলিয়ে যে জগৎ, তার থেকে এ জগৎ আলাদা। কবিতার বাজার কদাচিৎ তৈরি হয়। কিন্তু সিনেমা ও রেকর্ডিং কোম্পানি এসে সীমিত হলেও গানের একটি বাজার তৈরি হয়েছিল। অজয় ভট্টাচার্যের গানের খাতাগুলিতে বেশিরভাগ গানের নীচে তাঁর নিজের হাতে মন্তব্য লেখা আছে 'Paid'— অর্থাৎ সে গানখানি বিক্রি করে তিনি পয়সা পেয়েছিলেন। বিক্রি নিশ্চয়ই করতেন রেকর্ডের ব্যবসার

কোম্পানিগুলোকে, কারণ অনেক গানের নীচেই 'সোনোলা', 'এইচ. এম. ভি', 'হিন্দুস্থান', বা ' মেগাফোন' প্রভৃতি কোম্পানির নাম লেখা আছে। তাছাড়া আছে সুরকারের নাম। কিন্তু গায়কের নাম নেই— গায়ক কে হবেন, তা হয়তো সবচেয়ে পরে স্থির হতো। কখনো বা যে ছবিতে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার নাম আছে। সুরকারের নাম, রেকর্ড কোম্পানির নাম কোনো কোনো নাম কেটে নতুন করে লেখা আছে। মনে হয়, আগে থেকেই লেখা থাকত সেই গান, পরে সুবিধেমতো বিক্রি করতেন। যেমন, 'বঁধু স্বপন আমার তোমার ভাষায় ফুটলো কি' গানটির উপর প্রথমে Deluxe Pictures লিখে কেটে দেয়া হয়েছে। তারপর লেখা 'used in নব ভূতিকা, Mr. P.N.Ganguly।[১৮]

বস্তুত সিনেমার গানের বাজারের চরিত্র এমনই ছিল যে প্রায় 'ডজন দরে' অর্ডার আসত অজয় ভট্টাচার্যের কাছে। একটি খাতায় তিনি ইংরিজি বাংলা মিশিয়ে গানের টাইপের এইরকম একটি ফর্দ লিখে রেখেছেন, পড়তে মজাই লাগে:

Modern-২
ভজন-২
ভাটিয়াল-২
আগমনী, বিদায়-২
Duet Vatial-2

মোট দশটি গান, নীচে সুরকার শৈলেশ দত্তের নাম ও ঠিকানা লেখা: 'Sailesh Dutta, 15A, Bakulbagan Road, 1st floor'। খাতার শেষে 'Specimen Signature' বলে নিজের সই বেশ কয়েকবার মকশো করেছেন।[১৯] অনেক সময় সিনেমার মানুষেরা এসে তাঁর কাছ থেকে গান নিয়ে যেত। 'কি মায়া তব গানে আছে'— গানটির শেষে লেখা আছে 'taken by Hemanta Mukherjee– Hemanta Babu, Saroj Pictures"। সিনেমার জন্য পাইকিরি হারে গান লেখার একটি ভালো বর্ণনা দিয়েছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়: 'অজয়কে পেয়ে পরিচালকদের কি সুবিধে হয়েছিল জানেন? পরিচালক অজয়কে ডেকে বললেন — আমার ছবির এই জায়গায় গান চাই। অজয় পরিচালকের সঙ্গে তার গল্প, চরিত্র ও ঘটনা-সংস্থান সম্পর্কে বেশ ভালো করে situation গুলোকে হৃদয়ঙ্গম ক'রে ফেলল এবং দু'তিন দিনের ভিতরেই গান রচনা করে নিয়ে এল। পরিচালক হয়তো পাঁচখানির মধ্যে তিনখানি পছন্দ করলেন..., অজয় আবার দু' একদিনের ভিতরেই ঐ দুখানি নামঞ্জুর গানের এক একখানির বদলে তিনখানি করে গান নিয়ে হাজির হল ... ছবির জন্য গান লিখতে লিখতে সে আবিষ্কার করে ফেলেছিল কোন্ ঘটনায় কি ছন্দে গান বাঁধলে সঙ্গীত পরিচালকদের আর খুঁৎ খুঁৎ করার অবকাশ থাকে না।'[২০]

প্রথমেশ বড়ুয়ার ছবিতে অনেক সময় স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অজয় ভট্টাচার্য। অনেক ছবির সংলাপ লিখেছিলেন। গান লিখেছিলেন প্রচুর সংখ্যক ছবির জন্য, যেমন *অধিকার, অপরাধ, অভিজ্ঞান, অভিনেত্রী, অশোক* (তাঁর পরিচালিতও বটে), *আলো ছায়া, উত্তরায়ণ, এপার-ওপার, গ্রহের ফের, গৃহদাহ, ছদ্মবেশী, জীবন-মরণ, ডাক্তার, দেশের মাটি, নর্ত্তকী, নিমাই সন্ন্যাস, পথিক, পরাজয়, পরিণীতা, পাষাণ-দেবতা, বড় দিদি, মহাকবি কালিদাস, মায়ের প্রাণ, মুক্তি, মুক্তিস্নান, রজত-জয়ন্তী, রাজ কুমারের নির্বাসন, রাজগী, রাজ-নর্ত্তকী, শাপমুক্তি, সাথী, সাপুড়ে* ও আরো বেশ কিছু ছবি।[২০ক]

স্পষ্টতই বোঝা যায় যে রেকর্ড, রেডিও ও সিনেমা মারফত গানের পণ্যায়ন না হলে এ মানুষটির প্রতিভার সম্পূর্ণ স্ফূরণ হতো না। অথচ তিনি নিজেও — তাঁর সমসাময়িক মানুষেরাও তাঁকে সাহিত্যিক তথা কবির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন, যদিও কবি হিসেবে কিছুতেই তাঁকে সমসাময়িক কবিদের মধ্যে প্রথম সারিতে ফেলা যায় না। কিন্তু গীতিকার হিসেবে যে নজরুলের পরেই তাঁকে স্থান দেয়া হতো, এ কথা অনেকেই বলেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন পুলককে এ দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়নি। তাঁরা আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার হিসেবেই বাঙালির ইতিহাসে স্থান নিয়েছেন। অজয়কুমারের ক্ষেত্রে এই দ্বিধা কেন? এর উত্তর যেটুকু সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায় (অর্থাৎ যে উত্তর অজয় ভট্টাচার্যের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল নয়), তার খানিকটা সন্ধান করে এই নিবন্ধের ইতি টানব।

ইতিহাসের কোনো বিশেষ কারণে এক একটি জাত এক এক সময় শিল্পকলাগুণের মধ্যে কোনো একটিকে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেন। এর কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। জার্মানরা দেখেছি সংগীতকে সব কিছুর ওপরে মনে করেন। ফরাসিরা হয়তো ছবি। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি উনিশ শতক থেকেই সাহিত্যিকেই শ্রেষ্ঠ শিল্প বলে মেনেছে এবং যতদিন সাহিত্যের এই অবস্থানটি ছিল, সিনেমা ইত্যাদি শিল্পকে সাহিত্যের মর্যাদা ধার করে নিজের সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রটি তৈরি করতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত হরিসাধন দাশগুপ্ত, প্রমুখেরা ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন শুরু করে সিনেমা যে সাহিত্যের চেয়ে শিল্প হিসেবে খাটো নয়, তার যে একটি নিজস্ব শৈল্পিক আবেদন আছে—একথা বাঙালি তথা ভারতীয় দর্শকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগে সবাক চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে— ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ সাল— এ বিষয়ে বাঙালির দ্বিধা ছিল। চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে বোঝার প্রচেষ্টা যে ছিল না, তা নয়—*রূপমঞ্চ* পত্রিকাটির বয়স (অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুর সময়, ডিসেম্বর

১৯৪৩) দেখছি এক বছরের মতো। মাসিক পত্রিকা, 'অজয় স্মৃতি সংখ্যা'ই তার দ্বাদশ সংখ্যা। অর্থাৎ, ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই পত্রিকাটি। পত্রিকাটি ছিল 'বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি' নামে কোনো একটি সংগঠনের মুখপত্র। বলতে পারেন ফিল্ম সোসাইটিরই একটি আদি রূপ। এখানে এঁরা নিয়মিত বাংলা সিনেমা নিয়ে আলোচনা করতেন। বর্ণনা থেকে খুব বেশি লোক জমায়েত হতো বলে মনে হয় না, হয়তো উৎসাহী কুড়ি-পঁচিশজন হাজির হতেন। সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় এমনি একটি আলোচনাসভার বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে বক্তা ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। বিষয় ছিল বাংলা 'চিত্র জগতের বিভিন্ন সমস্যা'। যা বলেন অজয়কুমার তাতেও বাংলা সিনেমার শিল্প হিসেবে সামাজিক মর্যাদার কথাই উঠে আসে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় : 'বাংলা চিত্র জগতে নূতন মুখ দেখা যায় না কেন— হিন্দি ছবির তুলনায় আমাদের অভিনেত্রী স্পষ্টতই বা এত কম কেন?' উত্তরে অজয় ভট্টাচার্য বাংলার সিনেমা যে এখনো 'শিল্পের মর্যাদা' পায়নি সে কথাই বলেন, যদিও তাঁর মতে বাঙালি শিল্পী ও শিল্পপতিরাই চলচ্চিত্রে শিল্পের সাধনা করে থাকেন— 'জাতীয় শিল্প বলে চলচ্চিত্রকে মর্যাদা দানের সংগে নিউ থিয়েটার্সের নাম সর্বাগ্রে জড়িয়ে থাকবে... (ও) এজন্য শ্রীযুক্ত বি এন সরকারের কাছে বাঙ্গালী চিরদিন ঋণী থাকবে।' অজয়কুমার আরো বলেন যে বম্বেতে চলচ্চিত্রে 'শিল্পের দৃষ্টিভংগী না থাকলেও, তার পেছনে রয়েছে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী, যাঁরা নিছক ব্যবসার দিক থেকে একে গ্রহণ করেছেন।' বাংলায় এখনো এই নিছক ব্যবসায়ী মনোভাব তৈরি হয়নি। পরন্তু বাংলায় 'চলচ্চিত্রের জন্মের সংগে (ধনিক সম্প্রদায়ের) বিলাসপ্রিয়তা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ইতিহাস জড়িয়ে আছে....।' তাছাড়া অজয়কুমার বাংলা সিনেমায় 'লজ্জার ইতিহাসের' কথাও বলেন—'এতদিন যে সমাজ থেকে অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়ে আসছে...— কিরূপ প্রতিভাশালী অভিনেত্রীই বা আমরা আশা করতে পারি?[২১]

মোট কথা, বাংলা সিনেমায় সঙ্গে একটা সামাজিক অসম্মানের বোধ জড়িয়ে ছিল, এবং সিনেমা-সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করতেন যে সাহিত্যের সম্মান ধার করে সিনেমার সম্মান বাড়াতে হবে। একথা নিউ থিয়েটারস ও বি এন সরকারের ক্ষেত্রে শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা গুপ্ত তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন।[২২] *রূপ-মঞ্চ* পত্রিকাটিতেও এই মনোভাবের সাক্ষ্য মেলে। যেমন এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটার্স লিমিটেডের সুশীল কুমার সিংহ বলেন : 'সাহিত্যের সংগে সিনেমার সম্বন্ধ এককালে ছিল ভাসুর ভাদ্রবৌ। টকীর যুগে তার পরিবর্তন হোল। এই লজ্জা ঘুচিয়ে যাঁরা দুহাত এক করে দিলেন, শিক্ষিত বাঙালী একদিন তাঁদের দেখে বললেন— সাবাস্। কবি, সাহিত্যিক ও গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য ঠিক এই শুভ মুহূর্তেই...সিনেমায় দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাগ্দেবীর বাণী আরোপিত হোল লক্ষ্মীর মুখে।'[২৩] আবার ডিল্যাক্স পিকচারস-এর খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়— চিত্র জগতে সাধারণত হারুদা নামে পরিচিত— লেখেন : আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি এবং এখনো করি, যে দেশীয় সিনেমার সত্যকার কল্যাণ সম্ভবপর হয়, যদি দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ এই শিল্পে যোগদান করেন। তাই যখন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সর্বশেষ অজয় আমাদের এই সিনেমাতে যোগ দিলেন তখন আমার আনন্দ ও আশার সীমা রইল না।'[২৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই ডিল্যাক্স পিকচারসই অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত দুটি ছবির—*অশোক* ও *ছদ্মবেশীর*—প্রযোজনা করেছিলেন।

যথার্থ শিল্প বলতেই তাকে 'শাশ্বত' গোছের কিছু হতে হবে, 'উড়ে গিয়েই ফুরিয়ে গেল, সেই তারি আনন্দ' ধরনের কিছু হতে পারবে না, সাহিত্যই শাশ্বত শিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বা মডেল— এই রকম কিছু ধারণার বশবর্তী হয়েই বাংলা চলচ্চিত্রের নির্মাতা ও শিল্পীরা সিনেমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও গ্রহণযোগ্যতা খুঁজতেন। নিউ থিয়েটারস থেকে *অধিকার* (১৯৩৭) ছবির গানগুলি স্বরলিপি সহ প্রকাশ করা হয়। গান লিখেছিলেন অজয় ভট্টাচার্য, সুর দিয়েছিলেন তিমিরবরণ। বইটির নিবেদনে নিউ থিয়েটারসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল 'চলচ্চিত্রের বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য শান্তি-প্রয়াসী এবং সৌন্দর্য পিপাসু মানবমনের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করা।'[২৫] সিনেমার স্থান যে সচরাচর শাশ্বত শিল্পের নীচে ভাবা হয়, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল : দাবি করা হয়েছিল যে তিমিরবরণ গানগুলোকে-''বায়োস্কোপের গান' বলে লঘু সুর না-দিয়ে তাদের যথার্থ সঙ্গীতশাস্ত্রানুমোদিত সুরে সাজাবার প্রয়াস পেয়েছেন'', এবং ছবি পুরোনো হয়ে গেলেও অজয় ভট্টাচার্যের রচিত গীতগুলো 'চিরনূতন রূপে' মানুষের 'রসপিপাসার পরিতৃপ্তি' সাধন করবে।[২৬] ফলে সিনেমা যাঁরা বানাতেন তাঁদের মধ্যেই একটা দ্বিধা ছিল— একদিকে 'সাধারণের চাহিদা' না মেটালে পয়সা ওঠে না, অন্য দিকে শিল্পের তাগিদ, এবং সেখানে সাহিত্যই মডেল। এই দ্বৈত মনোভাব অজয় ভট্টাচার্যের গান কেন উপভোগ্য, সেই আলোচনার ক্ষেত্রেও এসে পড়ছে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অজয় ভট্টাচার্যের গানের একটি সংকলন বের হয়— তার ভূমিকায় একদিকে যেমন বলা হয়েছে 'গজল ও লক্ষ্ণৌ ঠুংরী প্লাবিত ১৯৩৫ সালের এই বাংলাদেশে... ছায়াচিত্রের গানে 'সাধারণের চাহিদা' মেটানোই অজয়কুমারের লক্ষ্য ছিল, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গেই দাবি করা হয়েছে এই গানেও তাঁর 'অপরূপ কাব্যপ্রতিভা পরিচয়ের' নিদর্শন পাওয়ার কথা।[২৭]

এই সময় নাগাদ শচীন দেববর্মনও তাঁর সুরে ঢালা অজয় ভট্টাচার্যের খান পঁচিশেক গানের একটি স্বরলিপি সহ সংকলন প্রকাশ করেন (এটি দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথমটি অজয়কুমারের জীবিতকালে বাংলা ১৩৪৫ সনে প্রকাশিত হয়)। শচীনদেবের 'নিবেদনেও' এই সাধারণ-বনাম- বিদগ্ধের দ্বৈততা প্রকাশ পায়: ''আমার পরম স্নেহাস্পদ কবি অজয়কুমারের বহু গীতি-রচনায় আমি সানন্দে সুর যোজনা করেছি এবং এ কথাও আজকের দিনে গৌরবের সঙ্গেই প্রকাশ করছি যে, কবির কথা ও আমার সুর সমাবিষ্ট হয়ে বিদগ্ধজনের সমাদর লাভ করেছে।... 'সুরের লিখন' যদি সর্ব্বগৃহে কিছুমাত্র আনন্দ দান করতে পারে তবে সমস্ত শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।''[২৮]

অজয় ভট্টাচার্যের গানের আরো কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়— ১৯৭৫ সালে তাঁর স্ত্রী রেণুকা ভট্টাচার্য (ইনি সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন) প্রকাশ করেন *অজয় গীতি সংগ্রহ*, ও ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ বার করে রেণুকা ভট্টাচার্যেরই সম্পাদনায়— *অজয় ভট্টাচার্যের গান*।[২৯] প্রথম বইটির ভূমিকায় নারায়ণ চৌধুরী ঠিকই লিখেছিলেন যে রাগভিত্তিক গানে কথা বসানোয় অজয় ভট্টাচার্য বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু গানগুলি পড়লে এটাও বোঝা যায় যে সুর ও গায়কী ব্যতিরেকে কেবল কথায় গানগুলোর অঙ্গহানি হয়। সুরকার, লিপিকার ও গায়কের অবদানের সংমিশ্রণেই এই গানগুলোর জীবন ও সার্থকতা। সত্যি কথা, অজয় ভট্টাচার্য ফরমায়েসি বা বাজারি গানেও অসাধারণ লাইন লিখতেন। তাঁর ছন্দ বা ভাষায় দখল ও তাঁর আন্তরিক কাব্যানুরাগ নিয়েও কোনো তর্ক নেই। কিন্তু তাঁর গানের সম্পূর্ণ রস যেগুলি সুরারোপিত হয়ে গীত হবার মধ্যে। এগুলো গান, কবিতা নয়।

পরবর্তীকালে— পঞ্চাশের-ষাটের দশকের—বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্পীরা আর সিনেমাকে সাহিত্যের ছত্রছায়ার নীচে রাখেননি। ফিল্ম যে তার নিজস্ব আঙ্গিকেই আর্ট হয়ে উঠতে পারে, সাহিত্যের দরবারে তার প্রতিনিয়ত কুর্নিশ করবার প্রয়োজন নেই— এ কথা সত্যজিৎ রায়েরা প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিত্র পরিচালকের সাহিত্যিকের সৃষ্টি বদল করার অধিকার আছে কিনা, *পথের পাঁচালীর* পর এ নিয়ে কিছু তীব্র বিতর্কেও লিপ্ত হয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়।[৩০] কিন্তু তা নাহলে হয়তো শিল্প হিসেবে সাহিত্যের ' হেজিমনি' (hegemony) খর্ব করা শক্ত হতো। অন্য দিকে 'সাধারণ মানুষ'— এই বর্গটির সম্প্রসারণ হলো, সিনেমার শিল্প যে বিনোদনের মাধ্যমেই হতে হবে, এবং বাজার বস্তুটির যে মূল্য আছে এ কথাও ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হলো। (এই প্রক্রিয়ায় বম্বের ফিল্ম জগতের একটি সর্ব-ভারতীয় অবদান আছে নিশ্চয়ই)। কিন্তু তার ফল হলো এই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর সম্পাদকদের দপ্তরে ঘুরে ঘুরে কবি খ্যাতির সন্ধান করতে হয়নি। বাজারি গানের তাঁরা কুশলী ও প্রতিভাশালী গীতিকার— এই পরিচয়েই তাঁরা সংগীতপ্রিয় বাঙালির স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছেন। এঁদের ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়েছিলেন যে প্রজন্ম, অজয় ভট্টাচার্য সেই প্রজন্মেরই একজন স্মরণীয় মানুষ। সবাক চিত্রের সেই প্রথম যুগের গীতিকারকে কিন্তু সাহিত্যের ছায়ায় কাজ করতে হয়েছিল। তিনি এবং তাঁর সমসাময়িক মানুষেরা বাজারি গানের নিজস্ব শিল্পমূল্য বিষয়ে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তই ছিলেন। এই দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারাটাই বাঙালি গীতিকারের আধুনিকতা।

টীকা ও পাঠনির্দেশ:

১. পশুপতি চট্টোপাধ্যায় 'স্মরণে', *রূপ-মঞ্চ*, ১২শ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ, পৌষ ১৩৫০ (১ই ১৯৪৩), অজয় স্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ৪২। গানটি হিমাংশু দত্তের সুরে জ্ঞান দত্ত গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ, 'অজয়ের জীবন কথা', ঐ, পৃ. ৬৭।

২. অজয় ভট্টাচার্যের গানের খাতা ইং ১৯৩৭ ও বাংলা ১৩৪১ সন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগেনস্টাইন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। এই খাতাগুলি সম্প্রতি অজয় ভট্টচার্যের পরিবার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছেন।

৩. রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ, 'অজয়ের জীবন কথা', *রূপ-মঞ্চ* (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ৬২।

৪. অবনীমোহন চক্রবর্তীর চিঠি, *রূপ-মঞ্চ* (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ১৩। অবনীমোহন চক্রবর্তী সম্বন্ধে রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ লিখেছিলেন: 'ঈশ্বর পাঠশালার তখনকার দিনে যে সব শিক্ষক বিদ্যালয়টিকে বাংলাদেশের চোখে বড় করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, বাংলার শিক্ষক শ্রীযুত অবনী চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঐ, পৃ. ৬৩।

৫. *রূপ-মঞ্চ*, (পূর্বোল্লিখিত), বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিচারণ দ্রষ্টব্য। বিশেষত পৃ. ১৭।

৬. *রূপ-মঞ্চ*, (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ৩৮। লেনিন-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'অজয় কর্তা', ঐ, পৃ. ৮০।

৭. অজয় ভট্টাচার্য, *ঈগল ও অন্যান্য কবিতা* (কলকাতা : রেণুকা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪১), পৃ. ৩।

৮. কুমার শচীন দেববর্ম্মা, 'অজয় পরিচিতি', *রূপ-মঞ্চ*, (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ১৮।

৯. অজয় ভট্টাচার্যের গানের খাতা, বাং ১৩৪১ সন, পৃষ্ঠার নম্বর দেয়া নেই, ২১৫ পৃষ্ঠার পর। রেগেনস্টাইন লাইব্রেরি, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ, (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ৬৭। এই সময়ে তিনি

Melancholia রোগে আক্রান্ত হন এবং এক সময়ে অনিবার্য ও আকস্মিক মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসেন'— ঐ, পৃ. ৬৯।

১১. অমল দত্ত, (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ৩৪

১২. ঐ, পৃ. ৩৬।

১৩. কুমার শচীন দেববর্ম্মা, 'অজয় পরিচিতি', *রূপ-মঞ্চ*, (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ১৯-২০

১৪. গোপাল ভৌমিক, 'কবি অজয় ভট্টাচার্য, *রূপ-মঞ্চ*, (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ৫০।

১৫. 'শ্রীপার্থিবের সফর বার্তা', *রূপ-মঞ্চ*, (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ৫৯। ভাষাচার্যের বক্তব্যে আধুনিক গানের শ্রোতা হিসেবে মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত আছে। আশাকরি তা কোনো ভবিষ্যৎ গবেষকের হাতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৬. প্রেমেন্দ্র মিত্র, ঝাপসা ছবি'', ঐ, পৃ. ১৬।

১৭. ধীরাজ ভট্টাচার্য, ' যে কথা মনে পরে', ঐ, পৃ. ৪১

১৮. অজয় ভট্টাচার্যের গানের খাতা, ১৯৪৩, পৃ. ১৪। রেগেনস্টাইন লাইব্রেরী, শিকাগো। আধুনিক গানের খুঁটিনাটি জানতে চান, এমন মানুষদের কাছে এই খাতাগুলো অন্য কারণেও আগ্রহের বস্তু। অনেক জনপ্রিয় গানের ছোটো ছোটো ইতিহাস এতে ধরা পড়ে। যেমন ধরুন, ভীষ্মদেবের 'যদি মনে পড়ে' গানটির শেষ লাইনে প্রথমে 'অতীত মুছিয়া' কথাগুলি ছিল, পরে কেটে 'তার ধ্যান থেকো প্রিয়' বসানো হয়। (গানের খাতা, ১৯৩৭, পৃ. ৬৮)। বা *অধিকার* ছবির বিখ্যাত 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' গানটির প্রথম রূপ ছিল 'দুঃখ দিয়ে গড়া যারা' (ঐ, পৃ: ১৩৩) (সুর তিমিরবরণ) অথবা 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে' সংশোধিত হতে হতে 'বীণা' ও বাঁশি, পরস্পর জায়গা বদল করে নেয় (ঐ, পৃ. ১৮৯)। বা এমনি করেই বুঝতে পারি 'তুমি নি আমার বন্ধুরে' গানটিতে 'রে' শব্দটি খুব সম্ভবত শচীনদেবের সংযোজন, ও আদিতে 'আঁধার নামে আমার বুকে' লাইনটি ছিলই না (খাতা বাং ১৩৪১, পৃ: ১০৪)।

১৯. গানের খাতা, ১৯৩৭, পৃ. ৩৯২। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের, বিশেষত পুরুষ মানুষদের আত্মমুগ্ধভাবে নিজের নাম সই করার একটি মজার ইতিহাস আছে বলে আমার ধারণা। বিশেষত যে সব পুরুষ মানুষ রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা নকল করতেন। আমার আত্মীয়দের মধ্যে, যাঁরা মোটামুটি অজয়কুমারের সমসাময়িক ছিলেন, এটা দেখতাম। হয়তো এটা রবীন্দ্র-পরবর্তী মানুষদের বাতিক ছিল, আমাদের প্রজন্ম বড় হতে হতে এর প্রকোপ কমে গেছে মনে হয়। এক সময় এই রকম আত্মীয়দের হাত থেকে ইস্কুলের খাতাপত্র বাঁচিয়ে রাখা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল!

২০. পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ৪৩।

২০.ক) অজয় ভট্টাচার্য, আজো ওঠে চাঁদ (কলকাতা, বাং ১৩৫২)

২১. কালীশ মুখোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, *রূপ-মঞ্চ*, (পূর্বোল্লিখিত), পৃ. ৩-৪

২২. Sharmistha Gooptu, *Bengali Cinema: An other Nation* (London: Routledger, forthcoming); পিনাকী চক্রবর্তী, *চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নিউ থিয়েটার্স*, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬/ষ্ঠ) ৮

২৩. *রূপ-মঞ্চ*, ঐ, পৃ. ১৫।

২৪. ঐ, পৃ. ২৩।

২৫. *স্বরলিপি: অধিকার চিত্রে গান* (কলকাতা নিউ থিয়েটার্স, তারিখ নেই), 'নিবেদন'।

২৬. ঐ।

২৭. *আজো ওঠে চাঁদ* (গীতিসংগ্রহ), গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য (কলকাতা : প্রকাশক সারদা সাহিত্য সংসদ ৫১-ডি একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ-এর পক্ষ থেকে বীরেন্দ্রভূষণ ঘোষ, মাঘ, ১৩৫২), 'ভূমিকা', সুখময় ভট্টাচার্য লিখিত। এর আর ঐ একই ঠিকানায় 'আলো সাহিত্য সংসদ' থেকে অজয়কুমারের জীবিতকালেই রমাপ্রসাদ মৈত্র *শুকসারি* বলে অজয়কুমারের চলচ্চিত্রের ও অন্যান্য গানের একটি সংকলন বার করেন (বাং সন ১৩৪৮)। এই সংকলনটিতে স্বরলিপি ছিল না, এবং অজয় ভট্টাচার্য নিজেই দাবি করেন যে সাধারণ্যে অপ্রচলিত, 'অপ্রসিদ্ধ' গানগুলোরও 'দাম কম নয়'।

২৮. *সুরের লিখন*, কথা 'অজয় কুমার ভট্টাচার্য, সুর কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মা (কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরী, চৈত্র ১৩৫২), 'নিবেদন'। বইটি শচীনদেবের পিতৃদেব 'মহারাজ নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুরের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে' উৎসর্গীকৃত। প্রসঙ্গ ত উল্লেখযোগ্য যে অজয় ভট্টাচার্য ও তাঁর গানের সংকলন, *আজি আমারি কথা* (কলকাতা: প্রকাশক সুখেন্দু বিকাশ মজুমদার, ১৪নং বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৩৭) উৎসর্গ করেন তাঁর 'গানের সহৃদয় ভাণ্ডারী তরুণ বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী কুমার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দেববর্মণ মহাশয়ের করকমলে'।

২৯. *অজয় গীতি সংগ্রহ*, সম্পাদক: নারায়ণ চৌধুরী (কলকাতা: রেণুকা ভট্টাচার্য প্রকাশিত, ১৯৭৫), *অজয় ভট্টাচার্যের গান*, সম্পা: রেণুকা ভট্টাচার্য (কলকাতা, প. ব. সরকার, ১৯৯১), এছাড়া বাংলা ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল *মিলন-বিরহ গীতি*। (কলকাতা: অর্দ্ধেন্দু প্রকাশ মজুমদার, ১৪, বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন, কর্তৃক প্রকাশিত, বাং ১৩৪৪)।

৩০. দ্রষ্টব্য: নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে *পথের পাঁচালী* বিষয়ে সত্যজিৎ রায়ের বিতর্ক, Shakti Basu & Suvendu Dasgupta eds., *Film Polemics* (Calcutta: Cine Club of Calcutta, 1992), pp.2-3.